পুঁজিবাদ, কার্ল মার্কস ও ফ্রানৎস ফানো প্রসঙ্গ

ড. এলহাম হোসেন

পুঁজিবাদ কোনো তত্ত্ব নয়, এটি একটি ব্যবস্থা। এর দ্বারা যেকোনো কিছু, তা সে বস্তু হোক, ব্যক্তি হোক বা প্রতিষ্ঠান হোক– তাকে অর্থ-মূল্যের ছকে মূল্যায়ন করা যায়। এই ব্যবস্থায় সব কিছুকেই পণ্য বিবেচনা করা হয়। আর এই পণ্যের চাহিদা বা কাটতি বিবেচনায় এর বাজার নির্ধারিত হয়। পুঁজিবাদী রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ব্যবসায়ের আর্থিক মুনাফার বিষয় নিয়ন্ত্রণ করে না। কল-কারখানা, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিমালিকানায় ছেড়ে দেয়। আর এই সুবিধা নিয়ে পুঁজির মালিকরা নীতি-নৈতিকতার বিসর্জনে মেতে ওঠে। নীতি পরিণত হয় দুর্নীতিতে। শুধু একটা নীতির চর্চা হয়– তা হলো মুনাফা অর্জনের কলাকৌশল রপ্ত করতে গিয়ে ভোক্তা, শ্রমিক ও পুঁজিহীনদের পণ্যে রূপান্তর করা। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা হাসফাঁশ করে বড় বড় পুঁজিওয়ালাদের চেইন সপের গ্যাঁড়াকলে পড়ে। অস্তিত্ব সংকটে পড়ে অনেকে ব্যবসায় ছেড়ে বড় পুঁজিওয়ালাদের শ্রমিকে পরিণত হয়। আর ক্রেতার প্রতি সমীহ তো দূরের কথা, সামান্য সম্মানবোধও প্রকাশ পায় না তার আচার-ব্যবহারে। সেকালে ক্রেতাকে ব্যবসায়ের লক্ষ্মী মনে করা হতো। আর একালে তাকে ভাবা হচ্ছে নিশিকুটুম্ব। বড় বড়, এমনকি মাঝারি মানের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানেও বিজ্ঞাপিত সতর্কবার্তা ক্রেতাকে কেমন জানি ধাক্কা দেয়-এই দোকানটি CCTV- র আওতাভূক্ত, অর্থাৎ CCTV আপনাকে নজরবন্দী করে রেখেছে। সেকালের লক্ষ্মী একালের সম্ভাব্য নিশিকুটুম্ব বা চোর। বানিজ্যজগতের এই পরিবর্তনগাথা পুঁজির আস্ফালনেরই কৌশলি বহি:প্রকাশ। এভাবে পুঁজিবাদ ভয়ংকর হয়ে ওঠে তার সর্বগ্রাসী ভূমিকার জন্য। সে কাউকেই সহ্য করতে চায় না। সে অর্থের সাথে সাথে রাষ্ট্রক্ষমতাকেও কুক্ষিগত করতে চায়। এই চাওয়ার প্রক্রিয়ার চুড়ান্ত পর্যায়ে এসে সে পরিণত হয় ফ্যাসিস্টে।

তবে মানুষ যাতে পুঁজিওয়ালাদের প্রশ্ন না করে, সেজন্য তারা খুব সাধারণ একটা নীতিবাক্য আউড়ে যায়– তা হলো- মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিই তো এগিয়ে যাওয়া, নিজের উন্নতি করা, আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করা। তাহলে তারা এ কাজে পিছিয়ে থাকবে কেন? এই আকাঙ্ক্ষা থেকে মানুষ তো গ্রামকে শহরে আর জঙ্গলকে বাসযোগ্য নগরে পরিণত করেছে। এই আকাঙ্ক্ষার ব্যাখ্যার সঙ্গে যখন উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে 'সভ্যতা', 'রেনেসাঁ' ইত্যাদি শব্দগুলো যুক্ত হয় এবং সেগুলো চোখ ধাঁধাঁনো কল্পচিত্র তৈরী করে, তখন তা পুঁজিবঞ্চিত সংখ্যাগরিষ্ঠরা ইতিবাচক হিসেবেই নেয়। কথিত আছে, ম্যানহাটান দ্বীপ মাত্র চব্বিশ ডলার অর্থমূল্যের বিনিময়ে স্থানীয়রা সাদা বণিকদের কাছে বিক্রি করেছিল। এই দ্বীপ নাকি এক সময় বন-জঙ্গল ও বণ্যপ্রাণীতে ভরপুর ছিল। সাদারা এতে শিকার করার অনুমতি পায়। পরবর্তীতে শিকারে তারা বন্দুক, গোলাবারুদ ব্যবহার করে। দ্রুত সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে তড়তড় করে এগিয়ে যায়। স্থানীয়দের অনেক পেছনে ফেলে দেয়। দ্রুতই তারা দ্বীপের মালিক বনে যায়। দখল করে কেন্দ্র। স্থানীয়রা চলে যায় প্রান্তিক অবস্থানে। এই অবস্থান পরিবর্তনের প্রধান উপষঙ্গই হলো পুঁজি। পুঁজি তৈরির প্রতিযোগিতা।

পুঁজি**বাদীরা তাদের** পুঁজি আহরণের এবং তা দিয়ে ফুলে-ফেঁপে ওঠার কায়দা-কৌশলকে জায়েজ করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে একটি চমৎকার শব্দ প্রয়োগ করে, তা হলো 'প্রতিযোগিতা'; প্রতিযোগিতায়

সম্পদ বাড়ে। মানুষের লুকায়িত শক্তির প্রকাশ পায়। কিন্তু এর বিপরীতে এ- কথাও সত্য যে, এই প্রতিযোগিতা সমাজে শ্রেণি-বৈষম্যও তৈরি করে। সম্পদ আহরণের প্রতিযোগিতায় নীতি-ধর্ম বিসর্জন দেয়ার অসংখ্য চাক্ষুস প্রমাণ চারপাশে তাকালেই প্রত্যক্ষ করা যায়। এটি মানুষকে স্বার্থপর বানায়, মানবিক মূল্যবোধের সৌন্দর্য খর্ব করে। যেহেতু প্রতিযোগিতার মুখ্য উদ্দেশ্যই শুধু জয়, তাই তা অর্জনের জন্য ম্যাকিভেলির নীতি অর্থাৎ শেয়ালের মতো ধূর্ত আর সিংহের মতো সাহসী হওয়ার নীতি সে অনুসরণ করে। প্রতিযোগিতার যুদ্ধক্ষেত্রে প্রথমেই নীতি-নৈতিকতার মৃত্যু ঘটানো হয়। এর জন্য বিবেকের দংশন বা বিবেককে সক্রিয় রাখা চলবে না। পরিণতিতে প্রতিযোগিতা প্রতিহিংসায় রূপ নেয়। অপেক্ষাকৃত দুর্বলরা নিপীড়িত হয়। ক্রমে প্রতিযোগিতা শ্রেণিসংগ্রামে পরিণত হয়। এই প্রতিযোগিতা ব্যাপকভাবে শুধু সমাজে নয়, ঘরেও শুরু হয়। ঘরের শান্তি বিনষ্ট হয়। সন্তান পরীক্ষায় প্রথম না হলে ক্ষোভ-দুঃখের অন্ত থাকে না। এ দুঃখ প্রশমনের জন্য তখন অর্থের প্রতিযোগিতাও শুরু হয়। এই অর্থের প্রদর্শনী তখন অসৎ পন্থায় পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস করা, সবচেয়ে ব্যায়বহুল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্তানকে পড়ানো, টাকা দিয়ে জিপিএ ৫ কিনে বংশের মুখ উজ্জ্বল করা ইত্যাদি...ইত্যাদি।

বর্তমানে চারপাশে হাহাকার শোনা যায়– গেল-গেল-সব কিছু পণ্য হয়ে গেল। শিক্ষা, চিকিৎসা, সামাজিক সম্পর্ক, প্রেম ইত্যাদি... ইত্যাদি। পণ্য হলো সেই জিনিস যাকে আমরা অর্থমূল্যের বিনিময়ে অর্জন করি। যত দামের পণ্য খরিদ করি ততো বেশি সামাজিক মর্যাদা অর্জন করি। অর্থাৎ বেশি মূল্যের পণ্য খরিদ করার সামর্থের সঙ্গে সামাজিক মর্যাদার বিষয়টা জড়িত। ঝকঝকে, চকচকে কাঁচের তৈরি প্রাসাদতূল্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে সন্তানকে পাঠালে সামাজিক মর্যাদা বাড়ে,কারণ সেখানে শিক্ষার বিনিময় মূল্য বেশি। ধর্মীয় আবেগকেও পণ্যে রূপান্তর করে কর্পোরেটরা এখন টেলিভিশনের পর্দায় ও বিলবোর্ডে ভোক্তার মনোযোগ আকর্ষণ করছে। পণ্যের গায়ে 'হালাল'- তা প্রকৃতপক্ষে হালাল হোক বা না হোক, শব্দটি সাটিয়ে দিয়ে বিশেষ ফায়দা হাসিলের চেষ্টা করা হচ্ছে। চারপাশে ভেজালের মহোৎসবে 'হালাল' শব্দটার এখন ত্রাহি অবস্থা। প্রাইস ট্যাগ পণ্যের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের গায়েও এখন সাটিয়ে দেয়া হচ্ছে। ইন্স্যুরেন্সের নামে দুর্ঘটনায় কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কতটুকু হারালে কত টাকা পাবেন, তাও এখন নির্ধারণ করা হচ্ছে। দৈবাৎ ভবলীলা সাঙ্গ করলে সাকুল্যে কত টাকা পাওয়া যাবে সেই অংক নির্ধারণ করেও এখন মানুষের জীবনের মূল্য ঠিক করা হচ্ছে। এমনকি সড়ক দুর্ঘটনায় পথচারী বা যাত্রী প্রাণ হারালে তার মূল্যও এখন অর্থমূল্যে নির্ধারণ করা হচ্ছে। এভাবে পুঁজি জীবন থেকে শুরু করে তা যাপনের সকল উপষঙ্গকে পণ্যে পরিণত করেছে তার অর্থমূল্য নির্ধারণ করে।

কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি ও সামন্তবাদের অবক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ইউরোপে পুঁজির উদ্ভব হয় ষোড়শ শতাব্দী নাগাদ। পুঁজির খোঁজে ও তার অঙ্গসৌষ্ঠব্য বৃদ্ধির উদ্দেশে ইউরোপীয়রা তখন ছড়িয়ে পড়ে এশিয়া, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকায়। আমাদের এই উপমহাদেশে ইংরেজ, পর্তুগীজ ও ফরাসিরা আসলেও শেষ পর্যন্ত প্রতিযোগিতায় টিকে থাকে ইংরেজরা। মোগল সম্রাট শাহজাহানের ফরমান নিয়ে ইংরেজরা সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে (১৭৫১) প্রথম বাংলা অঞ্চলে ব্যবসায় করতে আসে (শওকত আলী ১০৮)। কিছু বছর পর আওরঙ্গজেব সে ফরমান বাতিল করলে মোগলদের সঙ্গে ইংরেজদের সংঘাত বাঁধে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির লোকেরা হুগলি আক্রমণ করে বসে। জব চার্ণকের নেতৃত্বে পরবর্তীতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি হুগলি নদীর তীরে সুতানুটি গ্রামে আস্তানা গাড়ে। ক্রমে মাত্র ১৬০০০ টাকার বিনিময়ে সুতানুটি, কলিকাতা এবং গোবিন্দপুর গ্রামে ব্যবসাকেন্দ্র গড়ে তোলার অনুমতি লাভ করে। এরপর তো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শুধু এগিয়ে যাওয়া। শুধু ব্যবসা-বাণিজ্য নয়, এরা

স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে মিশেও যেতে শুরু করে। ইন্টারপ্যালেশন বা ইমপ্যাথি বলতে যা বুঝায়। কোনো কোনো ইংরেজ সাহেব তো কালিপুজো থেকে শুরু করে গঙ্গা স্নানেও অংশ নেয়। স্থানীয় মুৎসুদ্দিদের নানান সুযোগ-সুবিধা দানের বিনিময়ে এরা তাদেরকে চ্যালাচামুন্ডায় পরিণত করে। এরা শুধু তাদের সামনে দাঁড়িয়ে হাত কচলিয়ে 'ইয়োর ম্যাজেস্টি' বা 'ইয়েস স্যার' বলার চর্চা করতে শুরু করে। ১০০ থেকে ১৫০ ইংরেজি শব্দ রপ্ত করতে পারলেই নানান সুবিধা বাগিয়ে নেয়া যেত। ব্যবসার মাধ্যমে ইংরেজরা যখন পুঁজি বাগিয়ে নেয়, তখন তারা রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে দূরে থাকবে কেন? পলাশির যুদ্ধে সিরাজ-উদ-দৌলার পতনের পর এরা মীরজাফরকে পুতুল শাসক বানায় আর দেওয়ানি বা খাজনা আদায়ের ক্ষমতা কোম্পানি নিজের হাতে নেয়। খাজনা আদায়ের যজ্ঞে স্থানীয় চ্যালাচামুন্ডার পাশাপাশি কোম্পানির সাহেবরা এমন কোনো অপকর্ম নেই যা ঘটায় না। স্থানীয়দের মধ্য থেকে বিদ্রোহ দমন করতে স্থানীয়দেরকেই লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এদের উৎপাতে কৃষককূল বনে-জঙ্গলে পর্যন্ত পর্যন্ত পালিয়ে গেছে। রবার্ট ক্লাইভ, তাঁর উত্তরসুরি ও স্থানীয় মুৎসুদ্দিরা উপমহাদেশকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে পরিণত করে দু'শো বছর শোষণ-নিপীড়ন করে। কিন্তু ঔপনিবেশিকতার আফিমে আক্রান্ত অনেকেই বলেন ব্রিটিশরা তো আমাদের অগ্রগতিও উপহার দিয়েছে। দিয়েছে কিন্তু তার সুফল তারাই মূখ্যত উপভোগ করেছে। ১৮৪৩ সালে এখানে রেলগাড়ি চালু হয়। এরপর টেলিগ্রাফ। এ প্রসঙ্গে শওকত আলী বলেন, 'রেলগাড়ি ও টেলিগ্রাফ এই দুটি প্রযুক্তি যতখানি না এ দেশবাসীর প্রয়োজন, তার চেয়ে অনেক বেশি নিজেদের শোষণ ও শাসন বৃদ্ধি ও মজবুত করার স্বার্থে এদেশে চালু করা হয় (শওকত আলী ১১৭)। এ প্রসঙ্গে কার্ল মার্কসও বলেছিলেন যে, কোম্পানির সামরিক প্রয়োজনেই ভারতে রেলগাড়ি ও টেলিগ্রাফ/টেলিফোন ব্যবস্থা স্থাপন করা হয় (শওকত আলী ১১৭)।

এই উপষঙ্গগুলো তো পণ্যই। আর মার্কসের মতে পণ্যের সঙ্গে যুক্ত থাকে এর উৎপাদনকারী শ্রমিকের শ্রম ও পুঁজিবাদীর ভাবাদর্শ বা আইডিওলজি। ঔপনিবেশিক পুঁজিওয়ালা যখন এই পণ্য উপনিবেশিতের কাছে হাজির করে, তখন তা থেকে এরা শ্রমিকের ভূমিকাটা বাদ দিয়ে দেয়। শুধু রাখে তার নিজের ভাবাদর্শ। এরপর দেয় সে চাপিয়ে উপবেশিতের কাঁধে। উপনিবেশিত যখন এই পণ্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, তখন তার মধ্যে তৈরি হয় Fetishism for the commodity বা পণ্যের প্রতি প্রশ্নহীন আনুগত্য। এই আনুগত্য মুখ্যত ঔপনিবেশিকের ভাবাদর্শের প্রতিই যায়। ফলে, উপনিবেশিত ধীরে ধীরে নিজেকে সংজ্ঞায়িত করে ঔপনিবেশিকের ভাবাদর্শের ছকে। ফ্রানৎস ফানো যাকে তৃতীয় বিশ্বের কার্ল মার্কস বলা হয়, তিনি তাঁর *The Wretched of the Earth* বইয়ে ঔপনিবেশিক পরিচয়ের তত্ত্ব বিশ্লেষণেও দেখিয়েছেন কীভাবে ঔপনিবেশিকরা তাদের ভাবাদর্শকে পণ্যের রূপে স্থানীয়দের ওপর চাপিয়ে তাদেরকে আত্মপরিচয় বিস্মৃত জনগোষ্ঠীতে পরিণত করে। মার্কস ও ফানোর উদ্দেশ্য সকল মানুষকে নিপীড়ন থেকে মুক্ত করা হলেও এঁদের তত্ত্বকে শুধু শ্রেণি সংগ্রামের ভাসা ভাসা ধারণায় পর্যবসিত করা যাবে না। মার্কস জোর দিয়েছেন অর্থনৈতিক বিষয়ের ওপর আর ফানো জোর দিয়েছেন মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ের ওপর। ফানো এর সঙ্গে যুক্ত করেছেন চামড়ার রংকে। তাঁর মতে, সাদা-কালোর দ্বন্দ্ব যতটা না বাহ্যিক তারচেয়ে বেশি মনস্তাত্ত্বিক।

এই দ্বন্দ্বে সাদা চায় কালোকে হটিয়ে দিতে আর কালো তার অবচেতন মনে সাদা হওয়ার বাসনা পোষণ করে। যে কারণে ঔপনিবেশিতের পক্ষে পুরোপুরিভাবে ঔপনিবেশিক আধিপত্য মুক্ত হওয়া সম্ভব হয় না। এখান থেকে নয়াঔপনিবেশিকতাবাদের উত্থান শুরু হয়। ঔপনিবেশিক আর উপনিবেশিতের মধ্যে এই দ্বন্দ্বের বিচার বিশ্লেষণে মার্কস যেখানে মূলত অর্থনৈতিক উপষঙ্গের ওপর জোর দিয়েছেন,

ফানো সেখানে জোর দিয়েছেন মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া ও কাঠামোর ওপর। এ কারণে কেউ কেউ ফানোকে মার্কসবাদী বলতে আপত্তিও করেছেন। ফানোর 'Studies in a Dying Colonialism' এর ভূমিকায় অ্যাডলফো গিলি বলেছেন, 'ফানো মার্কসবাদী ছিলেন না' (ফোরসাঈদ ১৬০)। কিন্তু পিটার ওর্‌সলি তাঁকে মার্কসবাদী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কোজার তো তাকে সন্ত্রাসের গুরু বলেই আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর মতে, ফানোর ধারণাগুলো নাকি সন্ত্রাসবাদ উস্কে দিয়েছে। আসলে ফানোকে সঠিকভাবে মূল্যায়নের অভাবেই এসব অবমূল্যায়নকর ধারণার উদ্ভব হয়েছে। ফানো নিজে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ছিলেন। স্বাধীনতার সংগ্রামকে ফানো স্বাগত জানিয়েছেন। তবে তা যেন বর্বরতায় পর্যবসিত না হয়, সে-ব্যাপারে ফানো সতর্কও করে দিয়েছেন। তাঁর মতে, 'In a war of liberation the colonized people must win, but they must do so clearly, without barbarity' (Forsythe 160).

মার্কস এবং ফানো উভয়ই বিশ্বাস করেন, পুঁজিবাদের ভেতরেই এর ধ্বংসের বীজ লুকায়িত আছে এবং বিপ্লব হলো পুঁজিবাদের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার ফল। ফানো মনে করেন, পুঁজিবাদের মধ্যে জন্মগতভাবেই কিছু বৈপরীত্য থাকে যা এক সময় এক মহীরূহের রূপ নেবে এবং পুঁজিবাদের পতন ঘটাবে। ফলে, নতুন এক রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভব হবে। তবে এ প্রক্রিয়া এমনি এমনি ঘটবে না। মার্কস এবং ফানো উভয়েই বিশ্বাস করেন কাজে ও বাস্তবতায়, তত্ত্বে নয়। ফানো মার্কসের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলেছেন, 'What matters is not to know the world but to change it' (Forsythe 162).

মার্কস যেমন এই পরিবর্তনের জন্য মনে করেন যে, দুনিয়ার সকল মজদুরকে এক হতে হবে, তেমনি ফানোও মনে করেন, আফ্রিকা, মাদাগাসকার, ওয়েস্ট ইন্ডিজের তরুণরা এক হয়ে ঔপনিবেশিক নিপীড়নের কবর খুঁড়বে। মার্কসের মতই ফানো বিশ্বাস করেন যে, ইতিহাস প্রবাহিত হয় দ্বান্দ্বিকতার মধ্য দিয়ে, দলাদলির মধ্য দিয়ে, সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। তবে মার্কস এই দ্বান্দ্বিকতাকে অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে শ্রেণি-সংগ্রাম বলে বিবেচনা করলেও ফানো একে ঔপনিবেশিকতার প্রেক্ষাপটে গোষ্ঠীসংঘাত বলে বিবেচনা করেছেন (উইরিক,১২৪)। ব্যক্তির গোষ্ঠী-ভাবনা এবং তার অবস্থান নির্ধারণের তাগিদ থেকেই সে সংঘাতে লিপ্ত হয়। এক্ষেত্রে ঔপনিবেশিকতার প্রেক্ষাপটে ফানো দুটি গোষ্ঠী চিহ্নিত করেছেন। একটি সাদা, আর একটি কালো। সাদা ও কালো উভয়েই সুনির্দিষ্ট চিন্তাচ্ছন্নতায় আক্রান্ত হয়। সাদারা ভোগে উদ্ধত মনোভাবে বা সুপেরিয়রিটি কমপ্লেক্সে, আর কালোরা ভোগে হীনমন্যতায় বা ইনফেরিয়রিটি কমপ্লেক্সে। সাদারা চায় তাদের কর্তৃত্ববাদী চিন্তাচ্ছন্নতা বজায় রাখতে। কিন্তু এটি দ্বিপক্ষীয় বিষয়। এর জন্য দরকার স্বীকৃতির যা তারা আদায় করতে চায় কালোদের কাছ থেকেই। অপরপক্ষে, কালোরা চায় না সেই স্বীকৃতি দিতে, বরং তারা সাদাদের স্থানে যেতে চায়। প্রান্তিক অবস্থান ত্যাগ করে কেন্দ্র পুণরুদ্ধার করতে চায়। এতে সংঘাত বা দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে ওঠে। এই গোষ্ঠী-সংঘাত হলো মার্কস নির্দেশিত শ্রেণি-সংঘাত যা একটি ভৌগলিক এলাকা (ইউরোপ) থেকে উত্থিত, তা থেকে আলাদা। শ্রেণি-সংঘাত একই দেশের একই জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘটিত হয়ে থাকে। এরা অর্থনীতির মানদণ্ডে কেউ এগিয়ে থাকে, কেউ থাকে পিছিয়ে। কেউ মালিক, আবার কেউ শ্রমিকে পরিণত হয়। কিন্তু ফানো নির্দেশিত গোষ্ঠী-সংঘাতে দুটি গোষ্ঠীর অবস্থান ভৌগলিক দিক থেকে আলাদা। আধিপত্য চর্চাকারী গোষ্ঠী সচরাচর বহিরাগত। এদের সংখ্যাও কম। কিন্তু আধিপত্য চর্চার সব হার্ডওয়ার এদের হাতেই থাকে। অর্থনীতির বেইজ বা কেন্দ্রও থাকে এদের হাতে। তাই সুপারস্ট্রাকচারে থাকা স্থানীয়রা

সেই বেইজে যাওয়ার এবং তা পুণরুদ্ধারের সংগ্রামে লিপ্ত হয়। শুরু হয় গোষ্ঠী-সংগ্রাম। এক্ষেত্রে ফানো তাঁর *The Wretched of the Earth* বইয়ে বলেছেন, "The Governing race is first and foremost those who come from elsewhere, those who are unlike the original inhabitants, 'the Others'" (40).

ঔপনিবেশিকরা একটা দুর্বল শ্রেণি তৈরি করে এবং এদের কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায় করে ক্ষমতার লোক দেখানো গণতন্ত্রায়ণের জন্য। এরা এদের অনুকরণ করে, কিন্তু প্রতিবাদ করে না। এরা সাধারণত শহরকেন্দ্রিক। তবে বেশির ভাগ মানুষই থেকে যায় এই শ্রেণির বাইরে। এরা গ্রামীণ ভৌগলিক কাঠামোয় বসবাসরত কৃষক-শ্রমিক। এদের হারানোর কিছু নেই। যা আছে তা শুধু অর্জনের। এরাই হয় বিপ্লবী, আর বিপ্লবের মাধ্যমেই এরা অর্জন করতে চেষ্টা করে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য– *স্বাধীনতা* (*The Wretched of the Earth* 61)। তবে মার্কস ইউরোপের কৃষককূলের ব্যাপারে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন না। তিনি বরাবরই এদেরকে পশ্চাৎপদ ও প্রতিক্রিয়াশীল বিবেচনা করেছেন। তবে ফানো বিশ্বাস করেন যে, আফ্রিকার কৃষকদের ভাগ্য যেহেতু একই রকম, তারা যেহেতু সবাই ঔপনিবেশিকতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ এবং স্থানীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের শেকড়ের সঙ্গে এদের শক্ত সম্পর্ক বিদ্যমান, তাই এরা নিজেদের মধ্যে শ্রেণিতে বিভক্ত না হয়ে বৈপ্লবিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জাতি হিসেবে নিজেদের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম।

তবে গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে যে কৃষক শ্রমিকে পরিণত হয় এবং যারা কালাবর্তে বেকার, অলস ও পরাশ্রয়ীতে পরিণত হয়ে অপরাধ কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়, তাদের দ্বারা বিপ্লব সম্ভব নয়। যদিও মার্কসের মতে কারখানার শ্রমিকরাই বিপ্লবের প্রধান চালিকাশক্তি, ফানো এটি বিশ্বাস করেন না, কারণ এরা বুর্জোয়াও নয় আবার প্রোলেতারিয়েতও নয়। এরা ধূরন্ধর কর্মজীবী মানুষের মতো কায়েমী স্বার্থবাদীদের ব্যবসায়িক ফায়দার জন্য প্রতিবাদী মিছিল করে। এরা এদের তাদের অনুকরণকারী অন্তরসারশূন্য একটা শ্রেণিতে পরিণত হয়। মার্কসের মতে, শ্রমজীবী এবং প্রগতিশীল মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষই হলো ইতিহাসের নায়ক। কিন্তু ফানো এদেরকে ঔপনিবেশিকতার প্রেক্ষাপটে মূল্যবোধ বিবর্জিত, অন্তসারশূন্য, নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে ফাঁপা বলে অভিহিত করেছেন। ফানোর ভাষায়, 'There is only a sort of greedy little caste, avid and voracious, with the mind of a huckster... not even the replica of Europe but its caricature' (*The Wretched of the Earth* 175). এই শ্রেণির দ্বারা বিপ্লবের ইতিহাস গড়াও সম্ভব নয়, নতুন জাতিরাষ্ট্র গঠন করাও সম্ভব নয়।

আজকের দিনে তৃতীয় বিশ্বের কণ্ঠস্বরে পরিণত হয়েছেন ফানো। ফোরসাঈদের মতে, মার্কস বলেছেন ইউরোপের প্রেক্ষাপটে দরিদ্র শহুরে শ্রমজীবী মানুষদের কথা, আর ফানো আলজেরীয় আন্দোলন থেকে শুরু করে পৃথিবীর দেশে দেশে ঔপনিবেশিকতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ মুক্তিকামী সকল মানুষের কথা বলেছেন। যদিও ফানো উপনিবেশিতের স্বাধীনতার কথা মাথায় রেখেই তাঁর *Black Skin, White Masks* এবং *The Wretched of the Earth* লিখেছেন, তাঁর কাছে সাদা-কালো সকল নিপীড়িতই আশ্রয় খোঁজে।

মার্কস উদ্বিগ্ন ছিলেন ব্যক্তিগত সম্পত্তির উত্থানের ব্যাপারে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে ব্যক্তি তার চারপাশে খোলস তৈরি করে। এ খোলস শ্রেণির, শ্রেণি ব্যবধানের। সাধারণত চর্মচক্ষে চারপাশে সচেতনভাবে তাকালেই দেখা যায় এই ব্যবধানের চিত্র। এমনও দেখা যায় যে, বিশ বছর

পূর্বে এক ব্যক্তি হয়ত পাতি বুর্জোয়া ছিল। হঠাৎ আলাদীনের চেরাগ সে হাতে পেয়েছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির পাহাড় তৈরি করেছে। প্রাসাদতূল্য বাড়ি নির্মাণ করেছে। এই প্রাসাদের মুখে লাগিয়েছে বিশাল এক ফটক যাতে সেঁটে দিয়েছে এক সাইনবোর্ড। এতে লেখা আছে, 'কুকুর হইতে সাবধান'। এই ফটক ও সাইনবোর্ড শ্রেণিবিভাজক তো বটেই। কার্ল মার্কস আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, এই ব্যক্তিগত সম্পদের উত্থানই সকল অপকর্ম বা অন্যায়ের মূলে নিহীত থাকে। অপরপক্ষে, ফানো আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন দাসপ্রথা ও ঔপনিবেশিকতাবাদ নিয়ে। তাঁর কাছে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বৃদ্ধির বিষয়টা ছাড়াও বেশি আশঙ্কার বিষয় নয়, আশঙ্কার বিষয় হলো ডিহিউম্যানাইজেশন বা বি-মানবিকীকরণ। ফানো তাঁর *The Wretched of the Earth* গ্রন্থে দেখিয়েছেন, ঔপনিবেশিকতা কৃষ্ণাঙ্গদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করেছে, আর ঔপনিবেশিকরা এই ব্যক্তিগত সম্পত্তির অমানবিক ব্যবহার ও প্রয়োগ করে পুঁজির স্তুপের উচ্চতার বাড়বাড়ন্ত ঘটিয়ে চলেছে। এই কৃষ্ণাঙ্গ দাসদের সঙ্গে মনিব বনে যাওয়া ঔপনিবেশিকদের সম্পর্ক মানবিক নয়, অমানবিক। আর ঔপনিবেশিকতাবাদ একটি ওয়ার ফোর্স বা যুদ্ধশক্তি। ফানো মনে করেন, এর বিরুদ্ধে কোনো কিছুই যেমন– কূটনৈতিক তৎপরতা, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ইত্যাদি কাজ করে না। তাই ফানো এর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামকে সমর্থন করেছেন। এই সংগ্রামের সামাজিক দিকও ফানো বিবেচনা করেছেন। নির্যাতিতরা যখন স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে লিপ্ত হয়, তখন তাদের মধ্যে একতাবদ্ধতাও তৈরি হয়। এটি ধীরে ধীরে ন্যাশনাল কনশাসনেস বা জাতীয় সচেতনতার ভিত্তিমূলও তৈরি করে। আর জাতীয় সচেতনতার শক্ত ভিত্তির ওপর যখন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র-কাঠামো তৈরি হয়, তখন তা আন্তর্জাতিকতার পথেও ধাবিত হয়। স্বতন্ত্র জাতীয় রাষ্ট্র-কাঠামো ছাড়া আন্তর্জাতিকতার আখ্যান বা বয়ান তৈরির প্রচেষ্টা বাস্তবিকভাবে ব্যর্থ হতে বাধ্য। ফানোর এই সশস্ত্র সংগ্রামের ধারণা মাও সে তুং ও চে গুয়েভারাও গ্রহণ করেছেন। কোনো আধিপত্যবাদী ঔপনিবেশিক গোষ্ঠী কখনই তার সকল কৌশল ও বলপ্রয়োগের অস্ত্র ব্যর্থ হওয়া ব্যতিরেকে তার উপনিবেশ গুটিয়ে নেয়নি। এ কথা ফানো দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন তাঁর *The Wretched of the Earth* গ্রন্থেও। তাঁর ভাষায় : History shows that no colonialist nation is willing to withdraw without having exhausted all its possibilities of maintaining itself' (155).

ফলে, বুর্জোয়া রাজনীতি বা রাজনৈতিক দলের চেয়ে গেরিলা যুদ্ধকেই ফানো ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে বেশি সফল কৌশল বিবেচনা করেছেন (ফোরসাঈদ ১৬৯)। সংঘাত বা সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেলে তা থেকেই পরবর্তীতে রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হয় বলেও ফানোর বিশ্বাস। ফানোর মতে, এই সংগ্রাম কখনো থামে না। মার্কস অবশ্য এক্ষেত্রে এক সুখি ভবিষ্যত রাষ্ট্রের ধারণা দিয়েছেন। কিন্তু ফানো মনে করেন, সংগ্রামের শেষ নেই। ঔপনিবেশিকতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হওয়ার পরও ব্যক্তির সংগ্রাম চলতেই থাকে দারিদ্র্য, ক্ষুধা, অভ্যন্তরীণ শ্রেণি-ব্যবধান, অশিক্ষা ও অনুন্নয়নের বিরুদ্ধে। এ ধারণা বিবেচনায় ফ্রানৎস ফানো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে আজ অতীব প্রাসঙ্গিক।

তথ্যসূত্র:

শওকত আলী, *শওকত আলীর প্রবন্ধ*, ঢাকা: শ্রাবণ, ২০১৭।

Fanon, Frantz, *The Wretched of the Earth.*Paris: Grove Press, 1963.

Forsythe, Dennis. 'Frantz Fanon: The Marks of the Third world'. in Phylon (1960-), vol. 34, no. 2 (2nd Qtr., 1937), pp. 160-170. https://about.jstor.org/terms

Wyrick, Daborah. ‘Fanon for Readers’. Hyderabad: Orient Longman, 1998.